ভয়

গেটটা ধাতব আর্তনাদ করে উঠলো। গরম ইস্ত্রীটাকে সাবধানে টেবিলের একপাশে দাঁড় করিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলো জয়শ্রী। লোক দু'টো ততক্ষণে গেট ও সামনের দরজার মধ্যিখানে যে অংশটুকু জানলা দিয়ে দেখা যায় তার আওতার বাইরে এসে গেছে। সবুজ-গ্রে-কমলা-কালো পোশাকের এক ঝলক দেখতে পেল সে। খোলা গেটের সামনে পার্ক করা ফিকে সবুজ 'ভেসপা'টার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি চালালো কিন্তু স্কুটারটা শনাক্ত করতে পারলো না। দরজার ঘন্টা বেজে উঠলো। প্রথম দু'বার অমায়িক মৃদু সুরে, তারপর অসহিষ্ণু রুক্ষতায়। জয়শ্রী তখন দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে। তক্ষুনি দরজা খুললো না। 'ম্যাজিক আই'এ চোখ লাগিয়ে দেখলো। কাচের ওপাশে বাড়িওলা রঙ্গরাজের পরিচিত বাটারফ্লাই গোঁফ ও রোল্ডগোল্ড চশমার আভাসে আশ্বস্ত হয়ে ছিটকিনি খুলে দরজার পাল্লাটা হাতখানেক ফাঁক করলো।

চোখে মুখে অমায়িকতার পরিমিত প্রলেপ বুলিয়ে বললো, "এই যে ----।"

রঙ্গরাজ ব্যস্তসমস্ত গলায় বললো, "শেষ পর্যন্ত আমার কাকাকেই পাকড়ে আনলাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি আমার কাকা মিস্টার জোসেফ বিজয়ন। আর কাকা, এই আমাদের গুড্ টেন্যান্ট্ মিসেস মুখার্জী। আমার আগের কারপেন্টার গাঁ থেকে চিঠি দিয়েছে যে সে আর ফিরবে না। মধ্যে থেকে গুচ্ছের লোকসান গেল আমার। বিশ্বাস করে পুরো টাকাটাই আগাম দিয়ে বসেছি ওকে ----। তা যা হ'বার হয়েছে। আপনারা আমার টেন্যান্ট্। আপনাদের অসুবিধে ভোগ করতে দিতে পারি না আমি। কোনমতেই না। কাজ যা বাকি আছে কাকাই করে দেবে। কাকার hobby'ই হল তাই। আমাদের জাতে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজকে অসম্মানের ভাবে না কেউ। জানেন তো স্বয়ং জীসাসেরও ওই পেশা ছিল!"

এ ঘর ও ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে দু'জনে। জানলায় পেলমেট নেই একটাও, ফলে এই ছ'মাস পর্দা ছাড়াই কাটাতে হয়েছে ওদের। এত দেরী করবে জানলে পেরেক ঠুকে হাফ্-পর্দার ব্যবস্থা করতো জয়শ্রী। কিন্তু রঙ্গরাজ গভীর জলের মাছ। জয়শ্রীর স্বামী অনাদি ফোন করলেই দরদ দেখাতো যেন অসুবিধাগুলো ভাড়াটের থেকে ওরই গায়ে লাগছে বেশী। ও নাকি হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এর বিহিত করতে, আর বড়জোর দিন দু'চার একটু কষ্ট ----। শুধু কি পেলমেট? ড্রয়িং-রুম, স্টাডি-রুম, কিচেনের কোথাও একটাও সেল্‌ফ্ লাগায়নি এখনও। কাঠের পাটাগুলো একটার উপর একটা থাক দিয়ে রাখা রয়েছে গ্যারেজের একপাশে। আর যত বইপত্তর, বাসনকোশন, মশলার শিশিকৌটো সামলাতে নাজেহাল হচ্ছে জয়শ্রী। আনকোরা নতুন বাড়ির প্রথম ভাড়াটে হওয়ার সুখ টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। শেষ পর্যন্ত অমন যে মাটির মানুষ অনাদি, সেও ক্ষেপে উঠেছে। রঙ্গরাজকে পষ্ট জানিয়েছে যে ওর ছেঁদো কথায় আর ভুলছে না সে। বাড়ির অসম্পূর্ণ কাজগুলো না শেষ করলে সামনের মাস থেকে ভাড়াও বন্ধ। সেই চিঠি পেয়েই টনক নড়েছে বাছাধনের সেটা বুঝতে বাকী রইলো না জয়শ্রীর।

রঙ্গরাজ ইংরিজী কথার ফাঁকে ফাঁকে হড়র মড়র করে কি সব বলছে কাকাকে। কাকা-ভাইপোতে কি শলাপরামর্শ হচ্ছে কে জানে! লোকটা আদপে ওর কাকা কিনা তাই বা কে বলবে ! জয়শ্রী মুখের অমায়িকতা বজায় রেখে বিরস, সন্দিগ্ধ মনে লোকটাকে ভাল করে দেখলো। নাদুসনুদুস, কালোকোলো রঙ্গরাজের পাশে মাঝারি রঙের ছিপছিপে মার্জিত ছিমছাম চেহারা। পোশাক আশাকও বেশ রুচিসম্মত, খুব উগ্র আধুনিক না হ'লেও। রঙ্গরাজের হাতীর কানের মত চওড়া ফ্লেয়ার প্যান্ট ও ক্যাটকেটে গাঢ় কমলারঙের ব্লেজারের পাশে ওর কম চওড়া গ্রে ট্রাউজার ও বট্‌ল-গ্রীন রঙের গতানুগতিক পুলোভার ভারী আরামদায়ক লাগে জয়শ্রীর চোখে।

"আচ্ছা মিসেস মুখার্জী, আমি চলি এখন। কাকা রইলো। মিস্টার মুখার্জীকে বলবেন ওঁর সঙ্গে পরে দেখা করবো।"

বিকট গর্জন করতে করতে 'ভেসপা'টা ছুটে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে।

"ড্রয়িং-রুমের পেলমেটগুলোই আগে লাগাই, কি বলেন?" বিজয়ন

প্রশ্ন করলো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো জয়শ্রী। তারপর অনাদির অর্ধেক ইস্ত্রী করা ট্রাউজারটায় ইস্ত্রী চালালো। বাহ্যিক শীতলতার আড়ালে ওর মন কিন্তু দারুণ উদ্বেগ ও অস্বস্তিতে ছেয়ে গেছে। বাবুনের কলেজ থেকে ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে বেজে যাবে। খুকু ফিরবে তার বড়জোর আধঘন্টা আগে। অনাদির অফিস পাঁচটা পর্যন্ত হ'লেও ছুটির পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফাইলে ডুবে থাকে সে। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর অভ্যাসগুলো ভালভাবেই জানে জয়শ্রী। কাজেই ওর ফিরতে সাড়ে ছ'টা বাজবে না সাড়ে সাতটা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। তার পক্ষে দুইই সমান। বরং, সত্যি বলতে কি, দেরী করে ফেরাটাই ভাল। কারণ তা না হলেই তো আবার ফাইলের পোর্টেব্‌ল্‌ পাহাড় আসবে সঙ্গে। দু'একটা মৌখিক কুশল প্রশ্ন করে তাতেই তন্ময় হয়ে যাবে আবার। মাঝ থেকে সেই কাগজের স্তূপ বার বার এঘর ওঘর সরাতে হ'বে ওকে। ছেলেমেয়ের বইপত্তর রাখারই সুবিধেমত জায়গা নেই একটা। চেয়ারে, বিছানায়, খাবার টেবিলে যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে সারাদিন। শেলফ্‌গুলো যদি লোকটা লাগিয়ে দিয়ে যায় তবে এতদিনে একটু সোয়াস্তি পায় ওরা।

ইস্ত্রী করতে করতে ওদিকে তাকাতেই জয়শ্রীর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিল। অপরিসর হলেও হাত দু'য়েক উঁচু এবং বেশ শক্তমত। স্থানাভাবে তার উপরেই সাজিয়ে রেখেছে দু'চারটে কিউরিও ও তাদের বিয়ের ফটোখানা। লোকটা সেই ফটোটা হাতে তুলে নিয়েছে। জয়শ্রীর কানদু'টো গরম হয়ে উঠলো। একটা অস্পষ্ট, ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল সারা শরীরে তার। মায়ের বিশবছর আগের সেই মন্তব্যটা যেন পরিষ্কার শুনতে পেলো সে। বিয়েবাড়ি আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে।

তারই মাঝে স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় কঁকিয়ে উঠলেন সুলোচনা দেবী, "ওগো, জামাইয়ের একি চেহারা ! এযে বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।"

জয়শ্রীর বাবা দাঁতে দাঁত পিষে চাপা তর্জন করলেন, "চুপ করো। পুরুষ মানুষের রূপ লাগে না। কার্তিক চেহারার জামাই চাইলে তার জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার মুরোদ থাকা চাই, বুঝলে? বিনে পণে ডানাকাটা পরী পার করাও চাট্টিখানি কথা নয় আজকালকার দিনে ----।"

প্লাগ খুলে ইস্ত্রীটাকে সরিয়ে রেখে ভাঁজ করা জামাকাপড়গুলো গোছাতে লাগলো জয়শ্রী। একটু তেরছা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন লোকটার কার্যকলাপ চোখেই পড়েনি তার। লোকটা ফটোটা সোফার পাশে পেগ-টেবিলের উপর রাখলো। টেবিলের অন্যান্য জিনিসও এক এক করে সরিয়ে রাখলো। তারপর টেবিলটাকে দু'হাতে তুলে জানলার কাছে নিয়ে গেল।

লোকটা হয়তো সত্যিই রঙ্গরাজের কাকা। কাকা হ'লেই যে বয়সের পার্থক্য থাকতে হ'বে ওবং চেহারার পার্থক্য থাকতে পারে না এমন কোন নিয়ম নেই। মনে মনে আশ্বাস খোঁজে জয়শ্রী কিন্তু বিকেল চারটে পর্যন্ত এই নির্জন লোকালয়ে ফাঁকা বাড়িতে এই উট্‌কো লোকটার সঙ্গে একা কাটাতে হ'বে এই বোধটা একটা চাপা ভয়ের মত ঘিরে ধরে তাকে।

শোবার ঘরের জানলাগুলো এক এক করে খুলে দিলো জয়শ্রী। যদিও ও ভালভাবেই জানে যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ আসবে না। কারুর কানেই হয়তো পৌঁছবে না সে আওয়াজ। আশে পাশে খালি প্লট পড়ে আছে শুধু। সব থেকে কাছের বাড়িটার সঙ্গেও অন্তত দু'শো গজের ফারাক। মনে মনে রাগ হয় নিজের উপর। বোকার মত লোকটাকে বাড়িতে ঢোকালো কেন? বললেই পারতো আজ অসুবিধে আছে, অন্যদিন এসো। অবশ্য অন্যদিনও এই একই সমস্যা থাকতো। রবিবারে কখনোই আসতো না ওরা। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজকে সম্মানের চোখে দেখে যে কারণে সেই একই কারণে রবিবারদিন মিস্ত্রীগিরিতে নিশ্চয়ই ঘোর আপত্তি এদের। তাছাড়া রঙ্গরাজ নেহাত বেকায়দায় পড়েই এসেছিল আজ। খোদ ভাড়াটেই যদি ফেরৎ পাঠাতো আর নিশ্চয়ই এ সুযোগ ফিরে আসতো না। এ বাড়িতে বাকি মাস বা বছরগুলো শেল্‌ফ্‌-বিহীন, আব্রুবিহীন অবস্থাতেই কাটতো ওদের ----। কিন্তু এখন উপায়? দৈনন্দিন গৃহকর্মের চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ততার অন্তরালে জয়শ্রীর আতঙ্কগ্রস্ত মন আঁতি-পাঁতি করে উপায় খোঁজে ----।

রান্নাঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে নারকোল কুরুনি দিয়ে নারকোল কুরছে জয়শ্রী। রান্নাঘরটা বড় অপরিসর। উঠোনের দিকে ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে একটু যা আলো আসে। সেই দিকে মুখ করে

বসেছে। দরজাটা ওর পিছনে। ড্রইংরুমের ঠুকঠাক আওয়াজটা থেমে গেছে এখন। ও ঘরে মানুষটার হাঁটাচলার মৃদু আওয়াজ পাচ্ছে। কি করছে কে জানে ! ও ঘরে গিয়ে একবার দেখে আসা উচিত জেনেও অস্পষ্ট ভয়-ভয় ভাবটা কাটাতে পারে না জয়শ্রী। নারকোলের মালাটা হাতে নিয়ে কান খাড়া করে বসে থাকে। ওই যে, হাঁটার আওয়াজ ---- এদিকেই আসছে এবার ----। জয়শ্রী তাড়াতাড়ি নারকোল কুরতে লাগলো কৃত্রিম একাগ্রতা সহকারে। লোকটা ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ওর নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে সে। ঘাড় শক্ত করে সামনের দিকে চেয়ে রইলো জয়শ্রী। বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডটা যেন তাণ্ডব নৃত্য করে চলেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটা একটু কাশলো। জয়শ্রী তবু নিঃসাড়।

আপনার কাছে একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার হবে কি? ছোট স্ক্রু-ড্রাইভারটা আনিনি।"

ঘাড় ফিরিয়ে বিহ্বল চোখে তাকালো জয়শ্রী।

লোকটা সপ্রতিভ গলায় আবার বললো, "আপনাদের বাড়ি একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আছে কি? আমি যেটা এনেছি বড্ড বড়।"

জয়শ্রী শুকনো ঠোঁট দু'টোয় ততোধিক শুকনো জিভটা বুলিয়ে নিলো একবার। তারপর আস্তে আস্তে উঠে সিঁড়ির ঘরটায় গেল। দিনের বেলাতেও আধো-অন্ধকার সেখানে।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে অনাদির টুল-বক্স'এর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "যা কিছু যন্ত্রপাতি এখানেই আছে। দেখুন তো খুঁজে পান কিনা?"

লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এবার ভিতরে এসে টুল-বক্স'এর উপর ঝুঁকে পড়লো। তারিফের হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

"আপনার স্বামীর কালেক্শান খুব ভাল। এ সব ব্যাপারে নিশ্চয়ই উৎসাহ আছে ওঁর?"

জয়শ্রীও একটু হাসলো এবার, "হ্যাঁ, বাপ-ছেলে দু'জনেরই সমান উৎসাহ। ছুটির দিনে ঠোকাঠুকির চোটে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয়।"

"ছেলে কত বড়?"

"উনিশ বছর হ'ল। বি.এস.সি. পড়ে।"

"ওই একটিই ছেলে?"

"হ্যাঁ। আর একটা মেয়ে। মেয়ে পনের বছরের। হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে এবার ----।"

লোকটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

তারপর অল্প একটু হেসে বলে, "আপনি ভাগ্যবতী।"

জয়শ্রী সঙ্কুচিত হয়ে বলে, "একটু কফি করি আপনার জন্যে। সেই সকাল থেকে এক নাগাড়ে খেটে চলেছেন।"

বিজয়ন স্মিত মুখে জয়শ্রীর দিকে চেয়ে বলে, "এক নাগাড়ে খেটে চলেছেন বরং আপনি। না-না, আমার জন্যে কষ্ট করবেন না। কফির ফ্লাস্ক আর স্যাণ্ডুইচ সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে আমার ভাইপো।"

"মিঃ রঙ্গরাজ সত্যিই আপনার ভাইপো ---- মানে উনি কি আপনার নিজের ভাইপো?"

"হ্যাঁ ও আমার দাদার ছেলে। ও অবশ্য বাপের চেহারা পায়নি। মামাবাড়ির আদল পেয়েছে। আমি আগে সিঙ্গাপুরে ছিলাম। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর ওখানকার ব্যবসাপাট গুটিয়ে চলে এসেছি। সেও প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেল। দাদার কাছেই আছি ----।"

"আপনার ছেলেমেয়ে?"

বিজয়ন উদাস মুখে বলে, "নেই। এরাই আমার সব।"

জয়শ্রী ধীর পায়ে চলে এলো ঘর থেকে।

জানলাগুলোর জন্যে বেশী সময় লাগলো না। তারপর ড্রয়িং-রুমের শো-কেসের তাকগুলো লাগিয়ে স্টাডি-রুম এবং সবশেষে রান্নাঘর। কাঁটায় কাঁটায় তিনটের মধ্যে সব কাজ শেষ।

বিজয়ন ঘরময় ছড়ানো কাঠের কুচিগুলোর দিকে চেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বললো, "আপনার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে গেলাম। সকালে অত করে ঝাঁট দিলেন মুছলেন, আবার সব নোংরা হয়ে গেল। আচ্ছা চলি, নমস্কার।"

"অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।"

গেটের বাইরে গিয়ে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সন্তর্পণে গেট বন্ধ করলো বিজয়ন। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করলো। একটু পরেই রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

শোবার ঘরের আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো জয়শ্রী। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো নিজেকে। কপালের দু'পাশে কায়দা করে ফাঁপানো চুলের ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাসে চামড়া উঁকি মারছে জুন মাসের ফাঁকা মাঠের মত। চওড়া সিঁথির দু'ধারে কয়েক গাছা শাদা চুল পাকাধানের শিষের মত উদ্ধত ভাবে খাড়া হয়ে রয়েছে। চিবুকের নীচে থলথলে মেদের তরঙ্গ ----।

জয়শ্রীর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বিষন্ন মুখে আয়নার সামনে থেকে সরে এলো সে।